সদ্‌গুরু - শরণাগতি

প্রথমে আমার জীবনের একটি ছোট্ট ঘটনা দিয়ে শুরু করছি কারণ অখণ্ড মহাপীঠের সাথে এই ঘটনাটি ওতঃপ্রতঃ ভাবে জড়িত রয়েছে। একটি পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা

শ্রীশ্রীঅন্ধবাবা—শ্রীশ্রীবড়মার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব

রন্ধনশালায় তার মায়ের কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলে মায়ের হাতে ধরা ফুটন্ত গরম জলের পাত্রটি হতে গরম জল বালিকাটির মুখে ও চোখে পড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ বালিকা আর্তনাদে ফেটে পড়ে। মা বিচলিত না হয়ে ওনার জানা আয়ুর্বেদিক যে ওষুধ, তাই দিয়ে কন্যার মুখে মাখিয়ে দিতে বালিকা কিছুটা শান্ত হলেও তার চোখ দুটি গরম জল পড়ে ঝলসে যাওয়ায় তখন সে যখন আর চোখ খুলতে পারছেনা, তখন বাড়ীর সকলেই তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কয়েকদিন পর একটু সুস্থ হলে তৎকালীন কোলকাতার বিখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীহার মুন্সী কে দিয়ে বালিকাটির পুনঃ চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন চিকিৎসা করা সত্ত্বেও চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি যখন আর ফিরে এলনা তখন শুরু হল পিতামাতার সদ্‌গুরুর প্রতি নির্ভরতা ও পরীক্ষা। গুরুদেব তাদের বলেছিলেন ''আমার স্থূলদেহ না থাকলেও জানবি আমি আছি, আমি আছি, আমি আছি!'' শ্রীগুরুদেবের উপর ওনাদের অপার ভক্তি ও বিশ্বাস দুইই থাকায় তারা তখন শ্রীগুরুর কৃপার উপর নির্ভর করে তাদের ছোট্ট বালিকা কন্যাটিকে রেখে দিলেন। শ্রীগুরুর উপর যদি পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, তাহলে যে কোন অসাধ্যসাধন হতে পারে। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। শ্রীগুরুদেবের উপর অপার বিশ্বাসে পিতামাতা শ্রীগুরুর ব্যবহারিক পাদুকার চরণামৃত আর চন্দন সহ চরণ তুলসী ওষুধ হিসাবে তাদের কন্যাকে প্রত্যহ সেবন করাতে লাগলেন। কিছুদিন পর গৃহস্থ শ্রীগুরু বিগ্রহে আরতির সময় একদিন হঠাৎ বালিকাটি 'দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি' বলে উঠতেই পরিবারস্থ ডাক্তারবাবু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না, ফলে তখন তিনি আশেপাশের বিভিন্ন দ্রব্যাদি বালিকাকে দেখাতে লাগলেন এবং বালিকাও তখন প্রতিটি জিনিষের নাম বলতে থাকল। তখন ডাক্তারবাবু সবাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে ঐ পাদুকা দুটি জড়িয়ে ধরে শ্রীগুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। পরবর্তীকালে বালিকাটি স্বাভাবিক কন্যারূপে পাত্রস্থ হল এবং তিনি যে সন্তানের জন্ম দিলেন তিনিই হলেন আজ অখণ্ড মহাপীঠের মহাশক্তি, মহামায়া স্বরূপিণী 'সর্বাণী মা' !

শ্রীশ্রীবড়মা—শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃদেবী

সকলেই জানে 'গুরু' শব্দের নিগুঢ়অর্থ। 'গু' অর্থাৎ অন্ধকার, 'রু' অর্থে আলো। সুতরাং গুরুই সংসার জীবনে চলার পথের অপরিহার্য্য দিশারী। যে মহাপ্রাণ মহাত্মা জীবকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখান তিনিই হলেন পরমগুরু। যাঁর করুণায় মুহূর্তেই জীবনের অন্ধকারের ঘোর মুছে যায়, জীব হয়ে ওঠে সজীব প্রাণোজ্জ্বল আলোকোজ্জ্বল এক বিশেষ সত্তা । যে আলো জীবনকে ধন্য করে সেই আলো হল গুরু সত্তা থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি।

গুরু সর্বদাই তাঁর মঙ্গল হস্তটি প্রসারিত করে শিষ্যভক্তের অমঙ্গলকে দূরে ঠেলে দেন। যার ফলে অনেক অমঙ্গলই তাদের স্পর্শ করতে পারে না। তবে শিষ্যভক্তকেও হতে হবে একনিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তবেই গুরুকৃপালাভ সম্ভব হবে। যারা যেভাবে গুরুর উপর নির্ভর করবে জাগতিক দিক দিয়ে, তারা সেভাবেই ফল ভোগ করবে।—

(১) যারা গুরুকে একান্তভাবে হৃদয় দিয়ে ডাকে, তাদের যে কোন প্রয়োজনেই গুরু অলক্ষ্যে তাঁর কৃপা হস্ত প্রসারিত করে তাকে পরিপূর্ণ করেন।

(২) শিষ্য-ভক্তের সঙ্গে সঙ্গেই গুরু সর্বদা বিরাজ করেন। তার বিপদকালে, তার সম্পদে, ধ্যানে, জপে, পূজা-পার্বণে, তার সেবায় ও বিশ্বাসে।

(৩) গুরুকে সম্পূর্ণভাবে পেতে হলে বিশ্বাস চাই, নির্ভরতা

চাই আর চাই পূর্ণ আত্মসমর্পণতা; তবেই গুরুকে হৃদয় মধ্যে একাত্মভাবে পাওয়া যায়।

'সবর্ণী' মায়ের দাদুর শ্রীগুরুদেব সাধুসীতারাম শ্রীশ্রী অন্ধবাবার কথায় বলি, 'আমি আছি, আমি আছি, আমি আছি।'

অবশেষে বলি—অখণ্ড মহাপীঠের সন্তানেরা পরম সৌভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবতী। তাই এই 'মা' (সবর্ণী মা) কে পেয়েছো। যে 'মা' জন্ম-জন্মান্তরের থেকেই মাতৃত্ব, গুরুত্ব ও মহত্ত্ব নিয়ে সর্বদা প্রকাশিত হয়েছেন। সে 'মা'ই এ জন্মে আমার কাছে এসেছেন। আমি তাকে হৃদয় দিয়ে লালন-পালন করেছি। এটাই আমার গর্ব। কিন্তু গর্বের ভিতর একটু অহঙ্কার থাকে, তাই বলব ধন্য।

—সাধুসীতারাম শ্রীশ্রীঅন্ধবাবার চরণাশ্রিতা
শ্রীমতী মণিদীপা শ্যাম (বড়মা)

হিমালয়ে কয়েকটা দিন

ভ্রমণ

ত্র্যম্বক গুহা

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

(৫)

সকালে নীচে নেমে আসতেই দেখি যোশিজী চা নিয়ে অপেক্ষা করছেন, আমি চা ও বিস্কুট খেয়ে সঙ্গে ছাতু, বিস্কুট, জল ও একটা ম্যাট্রেস নিয়ে গ্রামের পথে এগোলাম। এক জায়গায় এসে রাস্তা দু ভাগে ভাগ হওয়ায় কোন দিকে যাব ঠিক করতে পারলাম না, তবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই একজন ভদ্রলোক এসে গুহার রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। এতক্ষণ পাহাড়ের উতরাই পথে নামছিলাম এবার ক্রমশঃ উপরে উঠতে লাগলাম, কিছু দূর চলার পর আবার দেখি রাস্তা দুভাগে বিভক্ত, আমি রাস্তার ধারে বসে রইলাম, গতকাল এই পথেই ফিরেছিলাম কিন্তু আজ সব অজানা লাগছে, প্রায় আধঘন্টা অপেক্ষা করার পর দেখি একজন মহিলা আসছেন, রাস্তার কথা জিজ্ঞেস করতে পাহাড়ের উপরের দিকে চলে যাওয়া একটা পাকদণ্ডী রাস্তা দেখিয়ে দিলেন, রাস্তাটা দেখতেই চিনতে পারলাম এই পথেই কাল নেমেছিলাম। চড়াই পথে বেশ কিছুদূর ওঠার পর বুঝতে পারলাম ভুল পথে এসেছি কারণ জঙ্গল ক্রমশঃ ঘন হয়ে এসেছে, বাবাজীমহারাজের কি ইচ্ছে জানিনা, তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলাম দিনের বেলায় জন্তু জানোয়ারের ভয় নেই। আমি যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফেরত যেতে যেতে লক্ষ্য করতে লাগলাম উল্টোদিকের পাহাড়ে যে বাড়িটাতে গতকাল জল চেয়ে খেয়েছিলাম সেটা দেখা যায় কিনা, অবশেষে সেই বাড়িটা চোখে পড়ল, আমি বাড়িটাকে পেছনে রেখে পাহাড়ের দিকে চাইতেই একটা রাস্তা দেখতে পেলাম, কিছুদূর এগোতেই গুহাতে যাবার রাস্তাটা চিনতে পারলাম।

আমি গুহার উল্টোদিকে, কুঠিয়ার কাছে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম, খুবই আনন্দ হচ্ছিল এত পরিশ্রম করে অবশেষে পৌঁছাতে পেরেছি। চারিদিকে উঁচু উঁচু চীর গাছের জঙ্গল, আশেপাশে লোকজনের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

ঐতিহাসিক গুহা যেখানে শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয় শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ কতৃক দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

আমি গুহার ভেতরে ম্যাট্রেস বিছিয়ে ক্রিয়াতে বসলাম, ক্রিয়াতে দর্শন ভালই হল যা আগে কখনও দেখিনি। ক্রিয়া করার পর গুহার বাইরে আসতেই চোখে হাত চাপা দিতে হল কারণ এতক্ষণ চোখ বন্ধ থাকায় বাইরের আলো সহ্য হচ্ছিল না, চোখে হাত চাপা পড়তেই কূটস্থে দেখি একটি ত্রিভুজাকার গুহা, ভেতরে একটা গোল পাথরের পাশে দুটি হীরের মত জ্বলজ্বলে বিন্দু। বিন্দু দুটোর দিকে মন দিতেই মিলিয়ে গেল, পরে শ্রীশ্রীমাকে বাবাজীমহারাজ বলেছিলেন,— The two sparkling diamond like spots were the everlasting Bindu–the impression of the Linga Sharira of The Mahavatara and Sri Sri Lahiri Mahasaya which